একদিন, অশরীরী

ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ ১৯৬০

ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক
৬/১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন,
কলিকাতা-১২

শ্রীপ্রশান্তকুমার মান্না, মুদ্রাকর
মহাকালী প্রেস
৩৪-বি, ব্রজনাথ মিত্র লেন,
কলিকাতা-৯

তোমাদের

দেবব্রী
দিব্যদীপ
সম্পূর্ণা
বিন্দিতা

একদিন, অশরীরী

মাত্র এ অতীত লিখে

বাকি যত প্রাণ ও ধারণ

সম্ভব কি হতো, যদি

আমার মৃত্যুর পার থেকে

ও-রকম না তাকাতে —

পুজো পুজো রোদ, হাসিখুশি?

কথকজন্মের কথা

কোরা কাপড়ের খুঁটে নতুন আতপচাল, তোমাদের গাছের বেগুন
বেঁধে দিয়ে বলেছিলে : 'হরিশ্চন্দ্রের পালা, ও কথক, আর নয়
পূর্ণিমার সন্ধ্যায় ফিরে এসে শ্রীরাধার গল্পখানি বোলো'

আসশ্যাওড়ার ঝোপ, বাঁশবন পাড়ি দিতে-দিতে মাঝরাতে
কত মহাজনপদ একা গাই। সন এগারোশো সাত।
এই রাঢ়-বাঙলার আঠালো কাদায় ডুবে গেল

আমার সামান্য গাথা। বর্ষায় ঘর ভেসে
তোমার আতপ পচে ওঠে, জ্বরে কাঁপি, ভুল বকি ঘোরে
আমার নিজের গান মুছে দেয় ভারি হাতে মহাপদাবলী!

কথকতা ছেড়ে তাই হাটুরে বেগার, যত মড়া পোড়ানোর
কীর্তনেও ডাকে আজ। ভুলে গিয়ে চারণকবিতা
মাঠেঘাটে আল বাঁধি; আমার পুঁথির ব্রজবুলি

পোকাদের কাছে দিয়ে হেসে উঠি, কাঁদি, আর আকাশরেখায়
শ্রীরাধা হারিয়ে যান; মড়কের চাঁদ গুনে ক্লান্ত হয়ে গেলে
এই জীবনের মতো তোমার কাছেও মরে যাই....

জেনেসিস

ও আমার বধির ছেলে
তুমি ওকে শাপ দিয়ো না
ও আমার অন্ধ মেয়ে
ওকে আর যম-দখিনা
দুয়ারে দাঁড় করিয়ে
বাতাসের ঠেলায়-ঠেলায়....

ও আমার অন্ধ মেয়ে
চেনে না নিষিদ্ধ ফল
আজ সে দুধসাগরে
হাত নয়, স্রোত, কালোজল
আঁকড়ে, আঁকড়ে ধরে
সে-জলেই প্রদীপ ভাসায়....

ও আমার বধির ছেলে
শোনেনি জলের ছলাৎ
ও আমার অন্ধ মেয়ে
তুমি ওকে পরাস্ত রাত
শীত আর খিদের কামড়
দিয়েছ মৃত্যু-থালায়....

ও আমার অন্ধ মেয়ে
আলো ওর কাছেই চেয়ে
ছেলেটা বধির, না গো
ওকে আর শাপ দিয়ো না।

ঝাঁঝি

মাঝে নিরক্ষর নদী, তার 'পর গানে-গানে সাঁকো।
বোবা নৌকোটি যেন ঝোপ বুঝে, শরবন এড়িয়ে....
চরা জেগে আছে? পলি? কীসব আবাদ হয়?
সে-কাক ডাকেনি যার ইশারায় ভোর হবে। ঠুলি

এখন আমার চোখে। তবে কড়া তামাকপাতার
ধোঁয়ায়, আঁশটে গন্ধে শুরু হল তীরঘেঁষা
জেলেদের পাড়া। ওরা সেই কালবোশ চেনে না কি, তার
শ্যাওলার স্তর-স্তর তলপেটে আংটি, অভিজ্ঞান—

সতেরো অঘ্রান। আরমানি গির্জার গং শুনে বলতে পারতাম
কত ঘড়ি, হাত বাঁধা না-থাকলে এমনকি কত রশি জলও!
যেদিকে টেনেছ মাল্লা, জানো না সে-গাছটির কীটভুক জিভে
চোরা-আমিষের স্বাদ মানুষের হাড়-মাস মেটাতে পারে না?

ভারতবর্ষ

সিঁদুরে মেঘকে হলুদ ডানায় চিরে
ঠোঁটে খড়কুটো, ফিরেছ তখন রাত
আমি ডিম ফেটে তরল তরল.... তবু
শুরু হয়ে গেল প্রথম তুষারপাত

বিয়ের বাক্স হারিয়ে ফেলেছ, তার
চাবি বাজালাম, তুমি দোরে-দোরে ঘুরে
এনে দিলে নীল সোয়েটার। যায় বেলা
শ্রমশিবিরের পাঁচিলে ও কাঁটাতারে

সারাটা দুপুর কাঠের ডান পা টেনে
আজকে নতুন করে যে হাঁটতে শেখা
শেষ বিকেলেও অন্ধ দু-চোখ জেবলে
মা খুঁজে চলেছ আমাদের পথরেখা ?

ফেরা

লঘু-সংগীতের সুরে খিদেতেষ্টা বাজাতে-বাজাতে
লহরা সরিয়ে রেখে যেই তুলে নিয়েছি গিটার
অমনি ভেনিসের গ্রীষ্ম, শ্বেত প্রহরীর টানা চোখ
দেখতে পেলাম! জন্মে বৈদ্যনাথধাম বড়জোর

প্যাঁড়া ও ত্রিকুট, ছুটি, গাড়িটানা খচ্চরের হাঁপ--
তাকে হ্রেষা বলা যায়? অভিধানে হ-পাতায় মরা
প্রজাতিটির পাখা না গো আজ নাড়াতে পারি না।
তবে গর্ভে ফিরে যাব, দিনশেষে রাঙা মুকুলের

রূপ না, অন্তত ধুলো, অন্তত যে-কোনও রূপান্তর
এই পৃথিবীতে আজও পাওয়া যায়। মাতৃসদনে
সূতিকার সেই জবর তুলো গজ কাঁচা-নর্দমায়
ঢের ভেসে আছে, আমি লঘু-সংগীতের ছল করে....

কুপার্স ক্যাম্প, ১৯৪৮

অন্ধ যদি বাকল খুলে নেয়—
হাসলে? যদি বাকল-পরা দাগে
হাত ছুঁইয়ে রাত্রি, রাত জেগে
চোখ পেল সে তোমার ঝাপটায়....

তোমায় কেন 'জল' বলেছি, বলো?
ধুলোয় ধুলো ঝরছিলে রাজপথে
চোখ ফেরা তো অলীক, তবু হাতের
প্রদীপ জ্বলে উঠেছে—চমকাল।

জ্বলেনি, শুধু অসার কররেখা
জ্বলে না, শুধু নিশুতি নিঃশ্বাস
একই চালে বৃষ্টি....বসবাস....
মায়েখেদানো, লজ্জা পেতে শেখা।

পাঁচ পয়সার খেয়া

'নিঃসাড় ধুলোয় দাও উড়িয়ে সে লেখার অক্ষর
যে লেখায় জল নেই. লাভা নেই, অভিশাপও নেই।'
[পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ : শঙ্খ ঘোষ]

চৈতক, তোমার প্রীতি দিতে পারে যদি অশ্বেতর
প্রতাপের দেহ তার পিঠে তুলে কাটি মানে-মানে,
সভাপর্বে চোখ বুজে ছিল তাই বস্ত্রের ধারণা
আজও পেতে যায় পার্থ ৪৪ হাড়কাটা লেন-এ ?
অন্নের মাছিরা বৃন্দ জমে উঠলে ভিখিরিবাজার
তবু মন আজ মুগ্ধ কাল বোধ পরশু ব্যাকরণে
মরা-কবিতার ঝুমকো টায়রা নথ সিঁথিমৌর
জাহাজেই ভর্তি করে বিরাটীতে বানতলায়
আদার ব্যাপারী—
কাচপোকাটির প্রাণ মরালীর কাছে কী অচেনা
চৈতক, তোমাকে পাব পাঁচ পয়সার খেয়া দিয়ে পাড়ি

গীতিপথ

একবার	হার্মাদের দলে	হাসি-হাসি কেটে নিই গলা
বারবার	চাষির মুনিষ	আইআরএইট, সুফলা।
তবু ওরা	খোজা করে দেয়	হারেমের বাধ্য ক্রীতদাস
কোনোদিন	মেলার সার্কাসে	দেখনি—'অন্ধকূপে বাস'!
একবার	ইস্কুল পালাই	বাঁশি নেই শিস্ সম্বল
বারবার	তোমার প্রেমিক	বুকে বাজে হু হু হাফসোল।
বিগ্রহের	কানপাশা বেচে	স্বর্গ কিনি বানাই নরক
অতি যত্নে	প্লেগের বীজাণু	নবান্নের আগেই মড়ক।
একবার	বুড়ো ভিস্তিওয়ালা	জল তুলে চালাই সংসার
বারবার	শেষ এক রান	ফিরে যাচ্ছি, ভারতের হার।

পাঠোদ্ধার

১.
সম্মোহিত, তুমি দাস-বাজারে এসেছ : শিকলের
ঘায়ে লেগে আছে আজ বিগত আবাদ, মরামাছি—
রাজি হয়ে গিয়েছিলে তবু শোনো নদীর আওয়াজ ?

২.
আবার ঝড়ের দিন, আরব-যুদ্ধ এল চা-এ
বাসি খবরের পাতা মুড়েছে পেঁয়াজকুচি, চপ
কাকু জেঠু বেয়াকুল, মেয়েস্কুল ছুটি হব-হব....

৩.
শুনেছ সংঘে আজ ঢাক বেজে উঠেছে ফেরার
পথে এত কাঁটাঝোপ. বন্ধ দরজায় মাধুকরী
করে কাকে ক্লান্তি দিলে কাকে সবুজের আশালতা ?

৪.
এসো লিপি, এ-ভাষার পাঠোদ্ধার করুক পোকারা
প্রলয়পয়োধিজলে ভেবেছিলে কত সেচকাজ
একদিন করে যাবে ! হাসির হরফে নামে জাল....

আগামীকাল

পড়শির খেত থেকে আজ আমাদের ছেলেদুটো
আখ চুরি করে খায় শীতের দুপুরে ন্যাংটোপুটো
লালদিঘি সাঁতরিয়ে তোমার জন্যেও রোজ ওরা
এনেছে কলমিলতা, ডালের সম্বরা

কতদিন ভুলে গেছ! ঘেয়ো হাতে দু-ভাই বাংলার
নদনদী ঝর্ণা নয়—ফ্যালফ্যাল ফ্রি-ইস্কুলের
নর্দমা থেকেই কিন্তু ধরেছে কাঁকড়া-সোনাব্যাঙ
বড় হামাগুড়ি দিল, ছোট হাঁকে, 'ঘোড়া ল্যাং ল্যাং'

তোমার সিঁথির ওই ধু-ধু পথে ঘোড়া ছুটে যায়
রাতের পান্তার মতো নুনআনা পলকে ফুরায়
ডাকাতে-কালীর বনজঙ্গল, সমুদ্র-সাত, নদী
চরে পুঁতে-রাখা আরো পাঁচ ভাই, পারুল বোনকে যদি

আমাদের যত ট্রেনে ট্রেনে গাওয়া
অন্ধ-গানের ঘোরে
খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায়, যদি প্রজাপতি ধরে-ধরে
হলুদ-মাখানো চিঠির হরফে রাখে
আগামীকালের কালো মেয়েদের ফাল্গুনে, বৈশাখে....

সেন্ট্রাল জেলের তরুলতা

যাও গতি

এই মহাসময়ের সাপচরা বালুকাবেলায়
তোমার বিস্তার থেকে অন্য এক ঘোড়ামুখ
এঁকে রাখি শ্যাওলার পেছলে

এইটি শ্বাসের মত দীর্ঘ ছিল, এটি ঠান্ডা ঠোঁটের ব্যর্থতা
এইটি হাসির মত কান্না ছিল, এটি আমি, ত্যক্ত বিপরীত

দাঁতে এত এত বালি, আঠাচুল,
কলের গান ও ভরাচাঁদ
লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ভেদ করে উঠে এলে
তোমাকে পৃথক করি, গতি

ছবির সমুদ্র থেকে আততায়ী নোনা-হাওয়া আসে
ছাপা কাগজের গন্ধে জিভে নিরুপায় মোহ, জল
আবার রথের দিন, 'ভাই ছুটি', ছুটির আকাশে
তোমাকে আস্কারা দেব। যাও
এক মুহূর্তের মৃত্যু দুই মুহূর্তের জন্ম তিন মুহূর্তের মদিরায়....

যাও গতি

আজও জানি না তো, কেন
কারা পুঁতে গিয়েছিল সেন্ট্রাল জেলের তরুলতা ?

দেনমোহর

পেটিকায় গোলাপেরা, কুলুপের পেতলে সবুজ
কলঙ্করেখার ফাঁকে ছোটবড় সহস্র আঁচড়
যত ভুল চাবি দিয়ে। অবশিষ্ট কেল্লার বুরুজ
কামানের গর্ত, থাম, থামে-বাঁধা বালক খচ্চর
একবাক্যে বলে দেবে কার জন্য এ-দেনমোহর
গচ্ছিত রয়েছে আজও—কে রেখেছে। এখনো তন্তুজ-
শাড়িতে লতানো, চোখে হটশট্ পর্যাপ্ত অবুঝ
হিসট্রির দিদিমণি দেখেনি খোদিত গোলাপের
কাঁটায় জহর ছিল....জুলেখার শেষ মুক্তিপণ।
কত যে ঝরোখা, ঝাড়, দ্বাররক্ষা, থুতু, কশাঘাত
মানে ঘাম, আশ্রফি আর শাহাজাদীর জীবন-
পাত্রে ভরা-ভাদ্রমাস....মেঘ-মেঘ....ব্যাঙ....বৃষ্টিপাত
এঁকেছিল দোষী হাতে সব বালি সমস্ত তরমুজ....
দিদিমণি জানে না তো কে জুলেখা : জানে আনোয়ার।

মাধুকরী

ভাঙা এ-শহরে বন্ধ দরজায় ঘুরেছি, শঙ্কর
বরফ গলিয়ে ফিরে দেখলাম সেই বিবরের
অস্ফুট ফসিল স্তন তেমনই কাঁকরমাটি-মোড়া—
আমার পায়ের নিচে আগুনের ব্যবহারে ওরা
নতুন নতুন করে জেবলে দিল ধনধান্য. তুষ

ঝটিকা-সফর সেরে বেলাবেলি বালুচরে ফিরি
ধোঁয়ায় দিনের অন্ন, ভাঙা শহরের মাধুকরী
পাত উপচে পড়ে আর পিপাসার দহে ভরাডুবি!
পাতাটি ভাসিয়ে শুধু রাত্রি শুধু অবোধ লিচ্ছবি
কালো সে-মেয়ের শাপে গানের তরীও ডুবে যায়....

চিড়িয়াখানা

দেখিয়াছি তারে রজনী উতলা হলে
বিজন আমার মরা নদীটির ধার
উড়িয়া এসেছে চিত্রিত ডানা মেলে
দেখি নাই শুধু শব্দ বেজেছে তার

শেষ জলধারা খুইয়ে ফেলেছি জেনে
সে যে ডেকেছিল অসময়ে মেঘমালা
বাতাস তাহার বারতা বহিয়া আনে
বাঁচব বাঁচব : হেসে ওঠে ডালপালা

দেওয়ালের কালো নিষেধ যে তুলে দেয়
নিষেধের পোকা স্বর্ণের কথা বলে
দুবণে শ্রাবণ, শীতের পাখিটি যায়
মেঘের দু-হাত ছাড়িয়ে যাবার ছলে

ছাড়িয়ে যাবার অনাবাসী আলো চোখে
উড়েছে কালেও, দ্রাবিড়-সভ্যতার
শেষ গান যেন ঘন নীল নখে-নখে
বিজন আবার মরা নদীটির ধার।

'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'

এমন দিনেই তারে বলা যায়
বাংলার ভারি নিষ্প্রদীপে
এ-দিনও বিগত হবে

তারপর নেমে আসছে শীতে
ছাতার রংওঠা রাত্রি ছায়া কালো কালো

কিন্তু প্রচ্ছন্ন বর্ষা
যদি তুমি আর একবার
মেঘদূত মিথ্যা করে মীড়ে বেজে উঠে

সময় থামিয়ে দাও—
মেরু-জুড়ে জ্বলে ওঠো আলো ?

আদমের জন্মদিন

ড্রাগনমুখো সে-মেঘটির চেরা জিভে
প্রথম আগুন চিনল শীতের পাতা

ঝরার আগেই ভোর-ভোর বনলতায়
জীবন, যেন এ-জীবনের মানে বুঝে

প্রজাতির শেষ পোকা মেলে দেয় ডানা
শালিখের ঠোঁটে আমিষ-অভিজ্ঞতা....

তখন গরম শিলাজলমাটি তাল-তাল
থেকে আমি সবে নিজের শরীর গড়লাম

টানা ঝড়, দুটো ডাইনোসোরাস ঝোপঝাড়
পাহাড় ঘিরেছে অজানা চোখের নোনাজল

একদিন আধোঘুমন্ত হাতে মৃত্যুর
সামনে কেন যে তোমাকে রচনা করলাম?

বসন্তের দু-টুকরো

১.
জারুল পাতার ফাঁকে ডেকে উঠল কোকিল এবারও।
কোকিলের খিদে তুমি গান ভেবে বাবু-কবিতার ধ্রুবপদ
হরফে হরফে ধরে চলে গেলে রাত্রিসীমানায়....

লোডশেডিং ঘাম চাপ বাজেট খেলার ফল তিথি না জেনেও
মা-কোকিল খুঁজে ফিরবে এবারের গ্রীষ্মে কার বাসা?

২.
'আদালতে গৃহলক্ষ্মী' পর পর তিন নাইট, তুমি
রাতজাগা চোখ মুছে নকল চুমকি-আঁটা নীল ওড়নায়
বাড়ি ফিরছিলে। আমি ঘুগনির দোকানে ছটা ডিশ
যেই ভেঙে ফেললাম, কোন্ দিকে উড়ে গেল হাসি?

হেমন্ত মণ্ডল যত খিস্তি দিক, মাইনে কেটে দিক
পুকুরে চাঁদের থালা ভেঙে তোকে আবার হাসাব

বসন্তের আরও দু-টুকরো

১.
আজ কী বর্ণের মেঘ? আমি রং ঘুঁড়ে নোনাধরা
ইটের গুঁড়োর সঙ্গে কফ-সিরাফ মিশিয়ে দেখলাম!
এ-ফুল, ও-পাতা, নুড়ি, চুনাপাথরের স্তর খোঁজার সুযোগে
যেদিন আমায় ছিঁড়ল মানুষখেকোর দাঁত, থাবা—
পটে যদি সেই মেঘ, তুমি সেই গুহার দরজায়

সাইনবোর্ড-আঁকা হাতে আজ রং বানাতে পারি না

২.
আর কটিবস্ত্র! ওই ইহকাল পরকাল খুলে
আমার মগজ নিয়ে চলে গেল শেয়াল-দম্পতি।
আমি ধূলিমাত্র, তবু ধুলোর অভাবে কারও ক্ষতি
পাছে হয়ে যায় ভেবে মরু-খেজুরের শাঁসে আশ্রয় নিয়েছি

বাঁ চোখ কাকের মুখ থেকে যদি কেড়ে নিলে, ও দৃষ্টিপ্রদীপ,
তার কালরাত্রি এলে আমার জন্যেও রেখো একটা পলক....

দেবীগর্জন

না রাত্রি না অন্ধ যাও সংগ্রহশালার ধুলো, আর
পোকা পোকা পোকা পোকা বাসা বেঁধো না গো সংকলনে
না মন্ত্র না ব্রতকথা—সর্বভূতের দেবী ওঁ
তোমার পায়ের পাতা ধুয়ে ধুয়ে ছন্দ-আবিষ্কার

যতরকমের নদী হয়ে ওঠে, গর্জন তেলের
প্রতিভায়
যমুনার কালো জলে কবিদের হাড়, এপিটাফ
লিখে ভুলে গেছি পিঠে-পায়েসের গন্ধও তোমার

পাড়ের সুতোয় বোনা সে-অলীক সুখের পাখিকে।
ভুলে গেছিলাম। কেন ফুঁড়ে উঠল কী নিপুণ জরা
পিঁপড়েরা কেঁদে গেল পুণ্যে পাপে শেষের রুটিতে—
খোলা বাজারের দরে এপিটাফ বিক্রি করে তুমি

আমাকে শালবন দিলে, পাহাড় এমনকি ঝর্ণাও ?
দিয়েছ ঘোড়ার সাজ—চিরহরিতের ঘাসজমি
পেরোতে পেরোতে দেখি হাসি নয় হাসির কঙ্কাল
পরে পাথরের বর্ম : তামা : ব্রোঞ্জ : লৌহ-ইস্পাত

আর তেজষ্ক্রিয় মেঘ। ভোরবেলা প্রসূতিসদনে
কত মুগ্ধ ভেসে যাওয়া....কেউ নেই বৃষ্টি-ভিজবার....

অপত্য

লতা, রাতারাতি আমি তোমার সবুজ ওই ক্ষার
খল ও নুড়িতে বেটে, রাতারাতি....('সারি, তুমি কার?')
সামান্য বিষের বড়ি বানাতেই রাত্রি নিভে গেল।

হারানো সোঁতার বালি ছেঁচে-ছেঁচে জল ও
অশ্বত্থ গাছের চারা এনে দিয়ে তোমাকে, আবার
বরফে পায়ের ছাপ ধরে নীল পাথর-বিকেলে

গ্রাম ধস উপত্যকা কুহেলীর চূড়ান্ত আড়ালে
ডেকে যায় এখনো যে গল্পের ইয়েতি—
তার জন্যে ফুলফল তার জন্যে বংশে সেজবাতি

যদি না-ও দিতে পারি, বলবে তো: 'ফিরে এলি ছেলে?'

ওরা আমায় থাকতে দিল, খেতেও
কাপড় দিল গায়ের তাতে বোনা
খেলার ফাঁকে কুঠে-মায়ের ছেলে
আমার গোটা দু'হাত ছুঁয়ে অবাক
তাকে দিলাম বাঁ হাত, ডান হাতে
কানের লতি ছিঁড়ে 'নতুন বউ
পরো সবুজ পাথর আজ থেকে'
চোখের পাতা, ভুরুর যত পালক
এইটুকুনি খুকুর জন্যে রেখে

পাড়ি

১.

ভরা বাদলের মেঘ, পরদ্রব্য নিতে নেই, তুমি
ঝরো যদি জলে জল....ঝরো যদি মশার সমিতি
খুঁজে পায় ফোলা পেট, পেটভর্তি পায়েস, ডিম্বাণু,
শ্ব-দাঁত, চিলের ছোঁ. তারপর মাংস হয়ে-ওঠা!

মেরুর বরফে
পেঙ্গুইন খোকাদের সঙ্গে দৌড়ে আসার পর
আমার ছেলেমানুষ-মা
লাল আটার রুটি বেলতে-বেলতে বলেছিল
যে-লেবুবন
ছেঁড়া কাগজের গন্ধে তাকে খুঁজে দিনরাত্রিদিন
খেলার প্রতিভা আর রচনাবলির গুঁড়ো
গল্পের নারী ডাইনোসর
মকরক্রান্তির ম্যাপ
ছিঁড়ে-ছিঁড়ে হেঁটে গেছে
যে-যার নিজের কুয়াশায়....

২.

ধু-ধু থেকে ধু-ধু : সেই রাত্রির আকাশে
জ্বলে উঠেছিল কত নতুন নক্ষত্র
যাদের
আলো এইমাত্র এল পৃথিবীর প্রথম নজরে

আমার কোঁচড়ভর্তি ফুটকড়াই
খাচ্ছি আর হেঁটে যাচ্ছি
নিকিরিপাড়া ছাড়িয়ে মালোপাড়া
বামুনপাড়া ছাড়িয়ে চাঁড়ালপাড়া
সেখান থেকেই
যেন মাটিফুঁড়ে কালোমত সেই বুড়ো
আমাকে নিয়ে তুলল কায়েতদের পোড়ো-ভিটেয়

আসশ্যাওড়া, উচ্ছন্ন বিল
বিলের ওপারে নাকি, বাপরে, কুঠেদের গ্রাম!

৩.

আমি জাহাজ তৈরি করলাম একদিন, আর সমুদ্র-ও।
আমার সুদূরে আমি নিজে নিজে....আর ব্যাকুল
ধুলোয় ভরে গেল
বারান্দায় ঝুলে-থাকা জেলাশাসকের কালো সায়া।
শীতের দাঁতাল ভোরে, লতা লতা, আমি ঘুণাক্ষরে
বলিনি তোমার নাম! রেলকমু ডাউন নৈহাটি
পাঁচটা পঁচিশে রোজ নদীব্রিজ ঝমাঝম....বটের কোটরে
তুমি কি ঘুমিয়ে আছ শঙ্খচূড়? তোমার ছোবল?

....

এই পথ দিয়ে দুই ভাইবোন, কাঁচাহাতে ঝুড়ির পসরা
কংক্রিটের বনে-বনে ফড়িংয়ের ডানা একদিন
কেবল রুটির খোঁজে নিয়ে এল, বাঙালিমায়ের
কাঁসার গেলাসভরা ছায়া আর জলের দুপুরে....
আলেখ্যের বৃথা রং...দেহাত...ট্রেনের বাঁশি....
তারপর সে-কহানী জানি না
তারপর রাত্রি, ক্ষুর, ওয়াগন ওয়াগন কয়লা,
'মাগো জল....'
জেলাশাসকের সায়া থেকে
সবটুকু কালো যেন
ছাপার কালির হ্রদ ফুসলে নিয়ে যায়।

৪.

ধু-ধু থেকে ধু-ধু পার হয়ে সেই রাত্রি
ভাম আর জোঁক পার হয়ে সেই রাত্রি
পীর-পীঠস্থান-হাওয়া, গর্ভ আর গর্ভপাত
লক্ষ্মণ সেনের
শেয়ালের ডাকে-জাগা বাংলার পলিমাটি
যোনি থেকে যোনি আর সারি-সারি
শিশুর কবর
পেরিয়ে-পেরিয়ে ভোর হলো—

ভাঙা ঘরদোর।
বুড়োটা কোথায়? আরে এইটুকু অন্ধ বাছুর
আমার কোলের কাছে শুয়ে আছে, নরম, কী সাদা!

তুমি বুড়ো তান্ত্রিকের মা-মরা মেয়েটা, কখন
শ্যামলী গাইয়ের দুধ এনে দিলে।
অযত্নের মেঘে-ঢাকা চুল
একবার দুলিয়েছ? দু-বার?
পাতালকালীর থানে নিয়ে গেলে হাত ধরে-ধরে
সিঁদুর, ধুনোর গন্ধ, হাড়কাঠ....বুক
জ্বলে উঠল মাটির প্রদীপে
সাঁতার জানো তো তুমি? তোমার গলার স্বর
ভুলে গিয়ে তারপর শুধু
শুধুই বাঁচার চেষ্টা, সেই বিল ছলাৎ-ছলাৎ....

৫.

কলমি শাকের ঝোপঝাড়
শালিধান শুকোয় চাতালে
তীরভাঙা ঢেউ, তুমি প্রাণ
মনে নেই কাকে দিয়েছিলে

ওরা আমায় থাকতে দিল, খেতেও
কাপড় দিল গাঁয়ের তাঁতে বোনা
খেলার ফাঁকে কুঠে-মায়ের ছেলে
আমার গোটা দু-হাত ছুঁয়ে অবাক
তাকে দিলাম বাঁ হাত, ডান হাতে
কানের লতি ছিঁড়ে: 'নতুন বউ
পরো সবুজ পাথর আজ থেকে'
চোখের পাতা, ভুরুর যত পালক
এইটুকুনি থুকুর জন্যে রেখে...

৬.

আমি সেই পতঙ্গের কথা বলিনি
যার পাখার উড়ালে মুছে যায় আবাদের পর আবাদ
সেই তীরের কথাও আমি বলিনি
যার করুণ শরীরে হিরে-মুক্তো-ফুলকারি
আর কোন বিষ মাখানো ছিল ফলায়?

সেইসব সমুদ্রের নাভি থেকে চোখ মেলল

আর উপকূল উপকূল জুড়ে তার বলিরা
সেইসব জাহাজের খোলভর্তি শৃঙ্খলিত
পুরুষ-পেশীর কথা
বলা হয়নি কান্না-ভুলে-যাওয়া কৃষ্ণাদের....

লেজ-ঝাপটানো কত রুপোয় রুপোয়
নৌকা দুলে উঠেছিল
তখন আকাশভরা
কর্কট রাশির শেষ নক্ষত্রে একটুকরো লাল অঙ্গার
আমি জ্বালিয়ে নিয়েছি শীতের খড়কুটো
সেই সুদূর বিপুল আঁচ থেকে।
শেষ পর্যন্ত মাছ-বিক্রির কড়ি দিয়ে কী কিনলাম?
কার গান মাঝপথে থামিয়ে
তার মেহেদি-রাঙানো হাতে তুলে দিলাম
বাদশাহের দস্তখৎ করা দলিল?

সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে কী যে লোভ হল, কে
জলপদ্ম নাকি স্থলপদ্ম-ছাপা উষ্ণতায়
লেপের নিচে স্বপ্ন দেখছিল মধুর মধুর
কেন সে আমায় ছুড়ে দিল না ডালকুত্তার
ঘ্রাণশক্তিতে?
মৃত্যু-কুঠুরির অন্ধকারে
'হে আলো হা বাতাস'—না করে
আমি খোলামকুচি দিয়েই লিখে রেখেছিলাম
জ্যোতির্বিদ্যার কোন্ সূত্রপাত?
যখন অমাবস্যার ভরা-কোটাল ও বজরা প্রস্তুত
কেন
জল্লাদের অনিবার্য ইস্পাত, আমি পালাতে চাইনি?

কার জড়বুদ্ধি ছেলের নাম রেখেছিলাম, অরণ্য?
কার অন্ধ-মেয়েকে পার করে দিয়েছিলাম
আমার, হ্যাঁ আমারই হাজার শরীরের
অবদমিত দাঁত-নখ
ও চায়ের কাপে হেডলাইন হেডলাইন তুফান দরিয়া?

বলিনি, আমার বলা হল না, বাংলা ভাষা
বলা হল না কে লিখে দিয়েছিল গীতগোবিন্দের
সেই অশরীরী চরণটি, এমনকি তার পায়ের পাতা-ও।

৭.

যতবার সেই তান্ত্রিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে
তাতার দস্যুর বোন, নাৎসী নার্স,
থুত্থুড়ে বুড়ি সেজেও
একবার
তুমিই নির্দিষ্ট ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিয়েছ
ধাবমান
মৃত্যুর সীমানা পার হবার হদিশ।

যতবার আমি নিশির ডাকে পাড়ি দিয়েছিলাম
যতবার তোমাকেই খুঁজতে-খুঁজতে আমি
পুড়িয়ে দিয়েছি পেট্রোলিয়াম, ভূ-গর্ভের কয়লা
যতবার আবেস্তা বাইবেল উপনিষদের পোকাধরা
পৃষ্ঠা থেকে
আমি টুকে নিয়েছিলাম
আত্মা-পরমাত্মার ধাঁধা ও উত্তর—
আমার কিশোরবেলা থমকে গেছে
আমি পাঠোদ্ধার করতে পারিনি
কোনও বাণী, সুসমাচার, কোনও শ্লোক!

বাদলমেঘে তোমার ক্ষণমুখর চোখ অনুসরণ
করতে-করতে
এ-মহল্লা থেকে তোলপাড় ও-মহল্লা
পাহাড় থেকে অন্তরীপ
লক্ষ্মণ সেন থেকে ভোটাধিকার....
আমি

খড়কুটো আঁকড়েও একবুক তুমুল নিঃশ্বাস
কী-যে ভালো
সে-সব জেনেই
মৃত্যুর ভরাট ছলচ্ছল কোলে মেলে দিলাম

আমার পরিণাম আমার একমাথা চুলের রুক্ষতা

আসলে আমার মতলব কি ভালো ছিল না—
তীব্র, শেষের সেকেন্ডে আমি কি ভেবেছিলাম
যদি অন্ধকার সেজে তুমি নিজেই আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও ?

আদিম জলকথা

: আদিম, তোমার আগেই আমার জল
মাটি ফুঁড়েছিল, আমি এই বৃথা জিভে
পাথর চেটেছি ভরা-তৃষ্ণায়, নিজের
রক্তপান। জল চেয়ে জানো কতবার
কত মৃত্যু জন্ম খরার ব্যবহারে
অগ্নিশিলায় বর্শা গড়েছি, মাংস খাই—
আদিম, তোমার জল দাও এইবারে।

: নিজেই এবার এসেছ অন্ধ-
নাচার চিত্রকর?
পশুদের তুমি স্বপ্নের ভূত, পাখি
তোমাকে দেখার আগে মরেছিল—
যাও
আচ্ছন্ন রয়েছে পাতা যেতোমার এই
ব্যাধজন্মের ঘুমে
মাটিঘসা রং, নখের তুলিকা
হাড়মাংসের মাটি
রচনা করেছি কবরের জমি
শরতের রোদে, ঘামে

: পরশকাতর, এইবার তোর ঘুমোতে যাবার আগে
জল নয় বাছা গলায় দিয়েছি লাল-লাল দুধধারা
পরশকাতর, এইবার তোর ঘুমোতে যাবার পরে
মহাপ্লাবন লিখে রাখলাম সময়ের ফাঁকে ফাঁকে।

: তুমিই আমার আদি বীজ। তুমি
বীজধারণের শ্যামল জরায়ু,
হয়েছ আমার মেয়ে
আবছা বাঁহাতে ছুঁয়ে আছ কেন সারারাত্রির জ্বর
ডানহাত তবু চেপে বসে এই রুগ্ণ গলায়, শ্বাসে

শীতার্ত সাদা হাত!

: তোমার জলের কাতরতা আমি
সাহারা বরফে ক্ষতে
শ্যাওলা সাগর পাথর ঝিনুক
জীব জড় রঙে-রঙে....
তুমি আঁকো ছয় ঋতুর তুলিকায়!

আলতামিরায়, মনে পড়ে, জলকথা?
কোনারক প্রায় গড়ে ফেলেছিলে, পাশে
জল ছিল
আমি বিষে ভরে দিই, জ্বালা ভরে দিই
আমার অশ্রু, নুনে।

: বর্শা ছুড়েছি। খুব খিদে পায়
বৃষ্টি আমি জন্মেও দেখিনি—
তৃষ্ণায় জল আঁকি, তুমি তার আবছা উপকথা
সাত-মাসে শুনেছিলে
গর্ভের বিপন্ন সঞ্চারী
তারপর ভুলে গেছি
শেষবেলা ছোট হয়ে আসে

জলজাতকের কথা, নলজাতকের কথা,
ত্রয়োদশ মুষ্টি-অবতার
কাঁথা ভেসে হিসি, হাসে
তুমিও মা ছদ্মরাগে রোজ
তাকে নগ্ন করে ধরো, ওম্ দাও
তার ক্ষীণ যৌন-ভবিষ্যত
বীমা করো কতবার এই সাধু ওই গ্রহ
পাঁচুঠাকুরের দোরে দোরে....

আলাদা আলাদা জল
অবাক অবাক জল
তোমার শেষের হাসিখুশি।

: এবার অন্ধ, চোখে সামর্থ্য দেব
এবার অবাক, এত রোদ ভরে ওঠে

এবার তোমার, আমি আর মুছব না
এবার মৃত্যু দিয়েছি চিত্রকর

করো জল, আঁকো, লিখে রাখো, গাও
অন্ধ-দিনের শেষে
মানচিত্রের লিপিচিত্রের চালচিত্রের
ভাসানের জলরেখা....

: চোখ ফোটে।
তুমি আজ ডানার বিস্তার।
তুমি আলো।
সুরের জোচ্চর এসে
প্রতীকের ঠগ এসে
হেমন্তের বনে বনে তোমারই দিন-যায়
বালিকাবয়স
সময়ের বক্রতল একবার, একবারই ভেদ করেছিল—
প্রতীক বাতিল করে আমি আজ আস্ত কাঁটাগাছ
দেখি তো না-কাঁদলেও তুমি
প্রান্তরের তৃষ্ণা বোঝ কিনা!

: ফিরেছ?
রাত্তির এত?
পায়ে-পায়ে চোরকাঁটা
বিচ্ছিরি
মারব—
খেয়েছিস?

তুষারযুগ

ভোরবেলা আঁধি এলে কাকে সেই রাত্রি বলে যাব?
আমার আগামীকাল করে গেছি সূচিপত্রে ভেদ
বিকেলের ধোঁয়াশায়। আজও কি তেমন করে স্বেদ
ঝরায় মাদারগাছ? ভো-কাটা ঘুড়ির মতো পাবো

হ্যাঁ বিগতা, কত একা নাম-নেই নদীর প্রস্তাবও
ভরাডুবি হতে-হতে তোমার দু-চোখের নিষেধ।
মাদারের আঠা দিয়ে রঙিন কাগজ নাকি শ্বেত-
মল্লিকার ছেঁড়াখোড়া জুড়ে জলা-জঙ্গলের....ভাবো

যে-প্রেত শরীর পেয়ে প্রেমিকের স্পর্ধায় সীমা
ভেঙে ছুটে এল যেন আষাঢ়-শ্রাবণ....খুশি....ভয়....
তোমাকে প্রস্তুত করে। যদি সাদা হাড় দেখা যায়
জানতে কি চাইবে তার বাড়ি আছে? সাকিন? দ্রাঘিমা?

কার কাছে গেয়ে যাব আঁধি আর যামিনী, বিমনা-
ওরা 'মানে' খোঁজে। জানো, আমার পায়ের নিচে নোনা-
মাটি ছেড়ে চলে গেছে কতদিন, বড় বেলাবেলি
'শেষ ট্রেন ধরে নেব': আট ক্রোশ ধুলো পার হয়ে

পথে আর নদী নেই, ডাক নেই: 'ওগো, ওগো নেয়ে....'
করাতকলের শব্দ। খাদে শুধু অসমাপ্ত বালি
দিয়ে ঘরবাড়ি নয়, তারও বেশ কানা বনমালী
কাহারের মত পেশী হত যদি—নখাগ্র পেরিয়ে

শিরায় ভিলের রক্ত, বাঘিনীর সঙ্গে তার বিয়ে
দেবার প্রস্তাবে রাজি। নিরস্ত্র। এ-বনের চামেলী
বৃথা কি কখনও যায়! পুরনো খাদান ঢুঁড়ে সীসা
শরীরে বিঁধিয়ে গেল শেষ ট্রেন, কালো-কালো ধোঁয়া

দিগন্তে এখনও ব্যস্ত। মেয়েলি হাতের ভেজা নোয়া....
কুপি নিভে গেছে....চেরা-জিভে অশ্রু চেটে পিপাসায়
শিশুর মুখের মতো দুধগন্ধ-ভরা হামি খেয়ে
কালীয়নাগের ফণা বাঁজা সেই মেয়েকে জড়িয়ে

ছাতিমগাছের নিচে ভিজেছিল আনকোরা হিমে।
ঘরে ফিরবার মুখে সাঁকোর আগেই যেন লোহা

আর নিম ছুঁতে পারে—ওরা তোড়জোড় উহু-আহা
জমিয়ে রেখেছে। আমি যমুনা ও যমের দক্ষিণে

যতদূর চলে যাই জলে-জলে অ্যামিবা আদিমে
লিপি খুলে রেখে ভাষা আবারও যে সুরে-সুরে গাওয়া—
এবার গ্রীষ্মেও তুমি রূপটান ঘুম নাওয়া-খাওয়া
ছেড়ো না গো। নিজে নিজে বুজে যায় খনিগর্ভ, ঢিমে

ডেভির বাতির আঁচে হাত আর কাঁকন পোড়ে না।
শুধু বাষ্প, নিভে-যাওয়া সূর্যের লীনতাপ ধরে
তোমার ছবির খাতা থেকে জলরঙের শরীরে
মেলে দিয়ে স্বপ্নপ্রাণ, মেলে তীব্র ঈগলের ডানা

সবুজগ্রহের সেই দুটো পিঁপড়ের চোখাচোখি
চরম তুষারযুগ নামার আগেই ঢেকে রাখি।

একদিন, অশরীরী

'মরে গেলে মানুষ হাত বাড়িয়ে তাকে তোলে।
বেঁচে থাকতে তোলে না কেন?'
[এ আবরণ : বিমল কর]

১.

[আ ব হ]

স্পর্শ এসো, এসো হাসি, কান্না এসো, এসো নিভুআঁচ
এসো তো বললাম কিন্তু এলে তোমরা কোথায় দাঁড়াবে?
কেন আমি ভুলে যাই বিষের বাষ্প আমি বর্ণমালা আমি
খোলস ছাড়ার ছন্দে শেষবার সে-শরীর ফেলে গেছি হেমন্তকৌতুকে

জ্বর এসো, ভরদুপুর, জলরঙে গরু আঁকতে গাধা
নোনতা বিস্কুটের টিন, আশাপূর্ণা, আলাদীন ও তার প্রদীপ—
এসো তো বললাম কিন্তু দিব্যি নীল বিষবাষ্প আমি
ইটের উইকেট থেকে শুভদের গলাধাক্কা, পেরিয়ে কালের কাঁটাতার

পায়েসের অত্যাচারে চন্দ্রমল্লিকা-ছেঁড়া জন্মদিন চৈত্রপবনে
বাবার ভরাটকণ্ঠে ঈশানের পুঞ্জমেঘ, না-বুঝেও শেষের কবিতা!
স্বপ্নের কলকাতা দেখে যে কালো বালিকাবধূ যাকে অজানার
বন্দরে চালান দেবে তেল-আভিভ বাহারিন তার রোগা ডানহাত আমি

আধবুড়ো জোচ্চরকে জীবনদেবতা ভেবে কত প্রেমে কত কৌতূহলে
আলুর চপের ঝাল জলচোখে হাসি আমি কী মিষ্টি লাল শরবত—
ট্রামগাড়ি হাওয়াগাড়ি গড়ের অফলা মাঠে পিরেতের রাত্রি-প্রদক্ষিণ
ভেবেছি বাঁচার গল্প তোমাদের দেশ-কালে, আমারও শরীর ছিল যেন....

২.

[ম হা শ্বে তা]

লাইব্রেরির বারান্দায় পৌষের আলো নিভে যায়
ভারি ইংরেজি বই, সাদা শাড়ি, বাণীবন্দনায়
বীণা হাতে দেখেছি তো। ফুলপ্যান্টে সদ্য-নাগরিক
আবছা হাসির স্তরে যেন তার কিশোরপ্রেমিক

বলে উঠি : 'কী ওজন, বইগুলো দাও দিদিমণি'—
দেবীও আস্কারা দেন : 'আমি কি রাস্তাঘাট চিনি?
রোজ একা আলিপুরে তুমি যে আসনি কতদিন'।
শীতের হঠাৎ সন্ধ্যা কেন বাজে পূরবীতে? ঋণ

কোনটা পরিশোধযোগ্য, কোন খাতা জল দিয়ে লেখা
নববসন্তের তোড়ে সে-হৃদিশ আমি শেষ দেখা
শেষ বর্ষায় ভেজা শেষ সাঁদ শেষ সারিডন
জানি না যৌবনবেলা, জানব না বোবা-বিসর্জন।

৩.

[ভা ষা র হ স্য]

জানো না আদিতে ছিল শব্দ নয় ছন্দ নয় রাত্রি, শিহরন?
তরঙ্গলেখায় আজ যেন কোন্ মধুরের রহস্যমালায়
রয়েছে শিথিলবেশে। গ্রন্থে তিন সেকেন্ডের সেই বিস্ফোরণ
পড়েছিলে ছন্দোগুরু, অভ্যেসের স্বরলিপি তোমাকে ঠকায়

কেন রয়ে যায়? আমি উপবীতহীন আমি ব্রাত্য, নির্বেদ
সমস্ত 'কেন'র পায়ে লাথি খেয়ে পুঁথি উলটে দেখি পোড়াজল
ছায়া নেই বনে-বনে। প্রাকৃতের যত কলা উপমা অভেদ
সান্ত্বনার মত, আজ শরণাগতের হাতে লাল বিষফল

আঁধারে তোমার সুদূরের ভাষা ভূতে-পাওয়া বাংলা-অনুবাদে
'সেচবাঁধ ভেঙে গেছে'—ধরো, এরকম যদি বার্তাটি দাঁড়ায়
তুমি পত্রকার সেজে একদৌড়, ঘুমচোখে প্রভাতী-সংবাদে
ভাঙার ছবিও থাকবে। তরুণ আলোকচিত্রি ফিলমি গান গায়

সাতমন তেলপোড়া ধোঁয়া ওড়ে রাঢ়বঙ্গে, উড়ো শালপাতা
মাড়িয়ে অবাক ছোটে হাফপ্যান্টে অপুষ্টি ও বালক-বয়স।
মস্করা করেও ভাষা এনে দাও পূর্বমেঘ বাতিল সন্ধ্যায়
ভাঙা সেচবাঁধ নয়, সিলুয়েটে বাবলার শান্ত কাঁটা, তার

রংকানা বিকেলটি হাটফেরত যদি দেয় পোড়া চামড়ায়
আঁচড় ও রক্তছাপ। ভাত খেয়ে হাসিখুশি কত অপেক্ষার।
রহস্যভেদের ফাঁকে ফেলুদার চারমিনার
বালি, মরুভূমি?

৪.

[য দি আ র - এ ক বা র]

কোন দেশে তুমি থাক, আমার যে স্মৃতি নেই মাগো
কোন ভাষা দেবে তুমি, ডাক দেবে 'ও আঁধার জাগো'
কোন ধর্ম আমাদের, গোত্রপরিচয়, কোন সুখাদ্য কেমন
কোন জাতি, কোন দিক, চামড়ার কোন রং. কোন তপোবন
আমার জন্যে তুমি রেখে দাও সবুজের জটিল ঠাট্টায় ?

'বলো বৃক্ষ ফল দাও, ছায়া দাও বনলতা সেন
বলো শেয়ালদার ট্রেন পা রাখার প্রস্থখানি দাও
মাসিক পত্রিকা আনো নস্ত্রাদামুর সুবচন
কবন্ধজন্মের গাথা চৈত্রের ভেলায় ভেসে যাও'

ভ্রূণ নাকি ভ্রূণা আমরা জানি না আঁধার, গান গাই
স্বাদ নেই স্বর নেই প্রাণের আদিমে, গান গাই
তোমরা যাকে সিয়ামিজ-যমজ বলেছ আমরা ওগো ভদ্রজন
তা-ও হব একটি দুটি, কানা খোঁড়া জড়বুদ্ধি, অকথ্যকথন
এখনও জানি না তাই গান গাই শিকড়ে-শিকড়ে।

৫.

[অ ন্য মে রি]

কেন জন্ম, জন্ম কেন, জেগে ওঠা. তাপ, হেলাফেলা
জাগার আগেই কেন তুমি বিষ মুছে দিয়েছিলে
'স্পর্শ এসো, স্পর্শ'....আমি সেই গান আবছা ভোরবেলা
ষোলোটি চরণ গেয়ে মিশে গেছি তোমার নিখিলে

একদিন তুমি পুতুলের লাল হাত
ছিঁড়ে দিয়েছিলে। ভাসিয়ে দিয়েছ জলে।
পড়া না পারার সেদিন চৈত্ররাত
মনে পড়ে গেল। জ্বলে ওঠে খুনি আলো....

তুমি যে শরীর দেবে, স্বপ্ন খিদে স্পর্শের যোগ্যতা
পাবার আগেই বিষ, মাগো বিষবাষ্পের আভাসে

ওষুধের গন্ধ মেখে ভেসেছি রক্তের শীতে,
কুমারীর অশ্রু, কোলাহলে।

৬.
[না নি ষা দ]

ঝর্ণার কলস্বরে নর্দমার কালোজল নদীর দিকে চলে যায়। চোরা-ঘূর্ণিতে ব্যাঙাচি, মশাপরিবার, অজানা মাছ আর আমি চক্কর দিলাম সারাদিন। ওদের সঙ্গে সবে একটু একটু জমে উঠেছে অমনি ছিটকে পড়েছি বেওয়ারিশ ভেজা জমিতে। একফালি চাঁদ। নর্দমার জলমেশা শেষ রক্ত মাটিতে মিশে গেল। ঝিঁঝিঁ ডাকা মাঝরাতে আমার কুমারী মায়ের স্মৃতি থেকে একটা একলা অণু বেলেপাথর জলস্তর আর ধাতুর খনিজ ভেদ করে আমাকে শক্ত কোলে তুলে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে পৃথিবীর গলিত কেন্দ্রের টানে। আশ্রয়। পথরেখায় গরম আর চাপ এত বেড়ে যাচ্ছে, সহ্য করতে পারত না পাঁজরের হাড়, রক্তমাংস, আমার বিগত শরীর....

যদি বিভাজিত হও তাপের চরমে তুমি অণু থেকে পরমাণু ভাঙতে ভাঙতে আর ধরতে না পার প্রাণ শেষের বিস্তারে...

আমি কাপালিকের আক্রোশে ওপেনহাইমারের প্রেতকে ওঁ হ্রিং আবাহন করলে তুমি রূপান্তরে হয়ে যাও সৌরজগৎ ধূলোকরা শক্তির আঁধার....

আর সমস্ত অতীত বিদ্রোহের দাঁতে-দাঁত পেরিয়ে আমি এই গ্রহটিকে করে তুলি মহাবিস্ফোরক....

সেই প্রলয়ের জলধারা সরে গেলে তীব্র মহাকাশে নরকবর্ণনার কবি দেশকাল-বিয়াত্রিচেহীন....

যত খরায় বন্যায় ক্রীতদাসের চামড়া পোড়ানো রোদে যত আষাঢ়-শ্রাবণ সর্বনাশে একদিন পৃথিবীর ক্ষত ও ভেষজ...

যদি এই অন্ধরাত, না নিষাদ, জড়....উদাসীন.... ?

৭.
[বি গ তে র ব্র ত ক থা]

স্পর্শ এসো, এসো হাসি, কান্না এসো, আবহমানের

জীবনধারায় সব প্রতিশোধতন্ত্রে এঁকে-রাখা
শবসাধনার ছবি ছিঁড়ে দাও সোনার ভাইবোন।
তেমন বিদ্যুৎলতা বৃষ্টি হয়ে চিরদিন অপমানিতের

মুখখানি তুলে ধরো, ঠোঁট রাখো শুকনো কাটাদাগে
ও সবুজ বটপাতা, কোটরে তক্ষক ডেকে গেলে
আচ্ছন্ন করো তাকে যে তোমার জীবন্ত, নিজের!
ভোরের লোকাল-ট্রেনে পায়েসের চাল আমি, রোগা মাসিমণি

লোভের পুলিশহাত কামড়ে দেব সাদা দুধে-দাঁতে।
হ্যাঁ স্পর্ধা, বেহুলা, সেই বাদাবন তোলপাড় রায়মঙ্গল
তুচ্ছ করে ডিঙি আমি জামালকে শহরের বড় হাসপাতালে
নিয়ে যাব।

সন্ধ্যায় চড়ারঙে খিদে আর অপেক্ষার নষ্ট মণিদীপা
বালিকাবেলার মত বাবার উষ্ণতা দেখো মাংসকেনা পুরুষের হাতে।
চন্ডালের হাড় গাও ‘পথের ক্লান্তি ভুলে’। আর শীতরাতে
নতুন আধুলি আমি বেজে উঠব অন্ধের থালায়....